পঞ্চম অধ্যায়

॥ ইতিহাসের আদর্শায়ন ॥

(আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম)

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন — "শেষ জীবনে বঙ্কিম যে সব গল্প রচনা করেন, তাহার পিছনে একটা করিয়া ইতিহাসের চিত্রপট ঝুলাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ধরা যায় না। তাহারা অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং ঊর্ধ্বপ্রবাহিনী ভাবধারা দ্বারা চালিত হওয়ায়, বারো আনারও অধিক কল্পনার দেশে গিয়াছে, — নিছক ইতিহাস হইতে বড় দূরে।" [১] পক্ষান্তরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন —' এই দ্বিতীয় কথাটি যদি আমরা স্বীকার করি, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়।" [২] অথচ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও 'সীতারাম' উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলে কখনো দাবি করেন নি। যদিও উপন্যাস তিনটিই ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে তিনটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পটভূমিতে তাঁর চিন্ময়ী মাতৃভূমি এবং অনুশীলনাদর্শের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন।

॥ আনন্দমঠ ॥

আনন্দমঠ (১৮৮২) উপন্যাস ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র গড় মান্দারণের কাহিনীর মতো ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনীও তাঁর খুল্লপিতামহের কাছে প্রথম শুনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন — "বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল', 'অজন্মা' এই সকল কথার সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না ; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহেস্থর, পরে ধনবানদের আহার

বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বসে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্যভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল ; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন।" [৩]

'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তরের এক অসাধারণ এবং অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন — " ১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা তুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখিনা, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা — তাহার বড় বড় চূড়ওয়ালা ধাম দূর হইতে দেখা যায় — সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথ-ফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল - লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষা-কালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয় ! — উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিত আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পালাইল, যাহারা পালাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পালাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল — জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না ; কেহ কাহাকে দেখে না ; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ

করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।" [৪]

মন্বন্তরের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, তা' যে কেবল খুল্লপিতামহের কাছে গল্প শুনে এবং কল্পনার সাহায্যে অঙ্কন করেছেন তা' নয়। এই বিবরণ তিনি হাণ্টারের গ্রন্থ থেকেও নিয়েছেন। হাণ্টার মন্বন্তরের পূর্বাভাস দিতে গিয়ে লিখেছেন –

"In the early part of 1769 high prices had ruled owing to the partial failure of crops in 1768 .... Inspite of the complaint and forbading of the local officers, the authorities at head quarters reported that the land-tax had been rigorously enforced; and the rents of 1769 .... seemed for a time to promise to relief .... The September harvest, indeed was sufficient to enable the Bengal Council to promise grain to Madras on a large scale, not withstanding the high prices. But in that month the periodical rains prematurely ceased, and the crop which depended on them for existence withered — 'The fields of rice; wrote the native superintendent of the Bishenpore at a later period, are become like field of dried straw." [৫]

হাণ্টার মন্বন্তরের অত্যন্ত মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবরণ প্রায় অবিকল হাণ্টার থেকে গ্রহণ করেছেন। হাণ্টার লিখেছেন —

"All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their implements of agriculture, they devoured their seed-grain, they sold their sons and daughters till at length no longer than any children could be found; they ate the leaves of trees and the grass of fields; and in June 1770 the Resident at Darbaar affirmed that the

living were feeding on the dead. Day and night a torrent of famished and disease sticken wretches poured in to the great cities. At an early period of the year pestilance had broken out. In March we find smallpox at Moorshedabad, where it glided through the viceregal mutes, and out of the prince syfut in his palace. The streets were blacked up with promiscuous heaps of the dying and dead." [৬]

দেশে যে মন্বন্তর আসন্ন একথা প্রভাবশালী রাজকর্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রজার দুঃখ দূর করার কথা ভাবলেন না। পরন্তু ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর Court of Directors-কে এক পত্রে জানান হল যে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা ভেবে সৈন্যদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য-শস্য গুদামজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [৭] এই সঙ্গে মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। "... In April a scanty spring harvest was gathered in; and the Council acting upon the advice of its Musalman Minister of finance, added ten percent to the land-tax for the ensuing year. [৮] এই অসময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রেজা খাঁকে দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিক স্মিথও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলেছেন — "The revenue affairs were solely incharge of Md.Reza Khan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added ten percent for 1771." [৯]

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " ১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ

নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে আর ডেস্‌পাচ্‌ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" [১০] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যে কিছু তথ্যগত ঐতিহাসিক ত্রুটি আছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, রাজ্য-শাসনে ব্যর্থতা এবং তাং জাতীয় মাদকাসক্তির কথা ইতিহাস সমর্থিত ; কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দায় তাঁর উপর বর্তায় না। কারণ, মন্বন্তরের অনেক আগেই ১৭৬৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মন্বন্তরের সময় বাংলার মসনদে আসীন ছিলেন তাঁর পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বঙ্গের সন্ন্যাসী - বিদ্রোহের ঘটনা লইয়া 'আনন্দমঠ' রচিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহার প্রকাশের পর অনেকে ইহার মূল ইতিহাস জানিতে উৎসুক হয়। 'দেবী চৌধুরাণীর' "বিজ্ঞাপনে" (১৮৮৪ সন) বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :

> "আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি - বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।"

এই প্রস্তাব অনুসারে আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণে (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ 'Gleig's Memoirs of the Life of Warren Hastings এবং W.W. Hunter's Annals of Rural Bengal হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।' ব্যাপার যে সত্য সত্যই গুরুতর হইয়াছিল, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠে তাহা আমাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়।" [১১]

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে হাণ্টার লিখেছেন —

"A set of lawless banditti', wrote the Council in 1773, known under the name of Sannyasis or Faquirs, have long infested these countries; and under pretence of religious pilgrimage, have become accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise'. In the years subsequent to the famine, their ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering, ravaging, in bodies of fifty thousand men. The Collectors called out the military; but after a temporary success our sepoys 'were at length totally defeated and captain Thomas (their leader), with almost the whole party, cut off'. It was not till the close of the winter that the Council could report to the Court of Directors, that a battalion under an experienced commander had acted successfully against them; and a month later we find that even this tardy intimation had been premature. On the 31st March 1773, Warren Hastings plainly acknowledges that the commander who had succeeded Captain Thomas, 'Unhappily underwent the same fate', that four battallions of the army were then actively engaged against the banditti, but that, in spite of the militia levies called from the land-

holders, their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged, such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the still life of Bengal." [১২]

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে একালের ঐতিহাসিক লিখেছেন —

"হেস্টিংসের সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা — 'সন্ন্যাসী — বিদ্রোহ'। রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতার সুযোগে অনেক সময়ই দলবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা — এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, ইহারা সাধুর বেশে নানা স্থানে ঘুরিত, হৃষ্টপুষ্ট ছেলে চুরি করিয়া দলবৃদ্ধি করিত, কেহ কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তাহাদের উপদ্রব বাড়িয়া চলে। নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল তাহাদের সাথে যোগ দেয়। হিন্দুরা সন্ন্যাসীদের ভক্তি করিত, সুতরাং তাহাদের কোন সন্ধান গভর্ণমেন্টকে দিত না। ফলে তাহারা অকস্মাৎ এক অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের নিকট অর্থ দাবি করিত — না দিলে বিনা বাধায় লুটপাট করিত। তাহাদের ভয়ে দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি জিলার লোকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ১৭৭২ সনে তাহারা রংপুরের সিপাহীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এবং ইহাদের নায়ক কাপ্তেন টমাসকে হত্যা করে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সন্ন্যাসীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমন করে। প্রতি দলে একজন নায়কের অধীনে প্রায় পাঁচ সাত হাজার নাগা সন্ন্যাসী ও অন্যলোক থাকিত। ১৭৭৩ সনে কাপ্তেন এডওয়ার্ডস ও সার্জেন্ট মেজর ডগলাস ৩০০ সিপাহী নিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া উভয়েই নিহত হন এবং মাত্র বারোজন সিপাহী

প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য হেস্টিংস ভুটানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং হেস্টিংসের অনুরোধে কাশীর রাজা চৈৎসিংহ সন্ন্যাসীদের দমনের জন্য পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কাপ্তেন ব্রুক একদল পদাতিক সৈন্য লইয়া সন্ন্যাসীদের দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমুদয় সত্ত্বেও কয়েক বৎসর পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের উৎপাত চলিতে থাকে। অবশেষে তাহারা বাংলা ও বিহার ত্যাগ করে এবং সম্ভবতঃ মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয়।"[১৩]

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " তারতে মুসলমান শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্মচারীদের অসহ্য অত্যাচারের ফলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। " [১৪]আনন্দমঠ উপন্যাসে এই অসহ্য অত্যাচারের কথা এবং বিদ্রোহের কারণ মহেন্দ্র সিংহের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন ভবানন্দ — " দেখ, যত দেশ আছে, — মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? কাঁটা খায় ? উইমাটি খায় ? বনের লতা খায় ? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায় ? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি - বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই ? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই ? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত' প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?" [১৫] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন — " তখনকার বিদ্রোহী মুসলমানের বিরুদ্ধেও হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাকে একত্র করিয়া দেখিবে ইহাই স্বাভাবিক।" [১৬]

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, 'রাজকর্মচারীদের অসহ্য অত্যাচার' কেবল হিন্দু প্রজা নয়, মুসলমান প্রজাদেরও সহ্য করতে হত। তাই সে অরাজকতার দিনে কেবল হিন্দু সন্ন্যাসীরাই নয়, মুসলমান ফকিররাও বিশৃংখলায় অংশ নিয়েছিল। যামিনী মোহন ঘোষ লিখেছেন — ".... the Muhammadan Fakir orders being organised

in imitation of Hindu Sannyasis adopted a similar dress and similar habits. It was therefore difficult to distinguish one from another." [১৭] এদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ। তাঁর দলে প্রায় দু'হাজার মুসলমান ফকির ছিল। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত মজনু শাহ রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরে উপদ্রব চালিয়েছিলেন। ১৭৮৭ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, এবং তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি ঐতিহাসিকতার ভাণ করেন নি। কিন্তু উপন্যাসের অনেক বর্ণনার সঙ্গেই আমরা ইতিহাসের বর্ণনার মিল পাই। আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র। প্রথম ইতিহাসে বলা হয়েছে যে বিদ্রোহীরা সাধুর বেশে নানা স্থানে ঘুরত এবং হৃষ্টপুষ্ট ছেলে চুরি করে দল বৃদ্ধি করত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধ বিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী — রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।" [১৮] দ্বিতীয় — ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " এড্ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, ঐ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন।" [১৯] তৃতীয় — ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজ সেনানায়ক ক্যাপ্টেন টমাস এবং ক্যাপ্টেন এড্ওয়ার্ডস্ পরাজিত ও নিহত হন। ১২ জন সৈনিক বাদে এড্ওয়ার্ডসের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। আনন্দমঠ উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে বিদ্রোহীদের হাতে টমাস পরাজিত হলেন এবং একজন আইরিশম্যানের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এড্ওয়ার্ডসের পরাজয় চিত্র আঁকা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেন্

হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।" [২০] এখানে বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে এডওয়ার্ডসের মৃত্যুর কথা বলেছেন। Sannyasi and Fakir Raider in Bengal গ্রন্থে বলা হয়েছে — "..... but the fate of Captain Edwards was not known; his hat was found in the Nulla before mentioned, but the body has never been found."[২১]

তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান সেনাদের যে ভাবে অঙ্কন করেছেন তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " প্রথমেই তো পোড়ায় গলদ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান-সেনা বৈষ্ণব, আর আসল সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, ... সত্যকার সন্ন্যাসী — ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারীও করিত ; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।"[২২] এই সব গিরিপুরীর দল যে একেবারে লুঠেরা ছিল, ওয়ারেন হেস্টিংসের রচনা পাঠে আমরা তা' বুঝতে পারি। তিনি লিখেছেন —

"Individuals of them are at all times scattered about the villages and capital towns of the province, ... they are continually seen on the roads armed with swords lances match-lock and generally loaded with heavy bundles...."[২৩]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে দেশপ্রীতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা' anachronism বা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। কারণ, ঐ ভাবের উন্মেষ ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষপাদে। [২৪] এই উপন্যাসে স্থানানৌচিত্য দোষও আছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল

উত্তরবঙ্গে, কিন্তু উপন্যাসের প্রথম চারটি সংস্করণে ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি।

উপন্যাসের শেষে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, ইতিহাসের এক বিশেষ সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছেন —" ইংরেজ এক্ষণে বণিক্ - অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে ; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।" [২৫]

'আনন্দমঠ উপন্যাসের সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তি প্রভৃতি চরিত্র অনৈতিহাসিক। কিন্তু এই সব চরিত্রের জীবনাদর্শ ও দেশপ্রীতি পরবর্তীকালে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার যুবক-যুবতীদের অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টির আধারে নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলন প্রদর্শন করেছেন। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সম্পদ 'বন্দে-মাতরম্', সঙ্গীত। 'বন্দে-মাতরম্' সংগীত এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বীজ 'কমলাকান্ত-এ নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি সত্য, কিন্তু আশ্চর্য সৃষ্টিচাতুর্য গুণে, তিনি ইতিহাসের প্রাণস্পন্দকে আমদের উপলব্ধি করিয়েছেন।

॥ দেবী-চৌধুরাণী ॥

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন —
" দেবী চৌধুরাণীরও (আনন্দমঠের ন্যায়) ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হন্টর সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account' মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় কথা নয়, এবং 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী ভবানী পাঠক, গুডলাড সাহেব, লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই

পর্যন্ত। পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।" [২৬]

হান্টারের গ্রন্থ পাঠে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে জানা যায় যে, - "In 1787 Leiutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaits (gang robbers), named Bhawani Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his Leiutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners.... We catch a glimpse from the Lieutant's report of a female dakait, by name Debi Chaudhrani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazs in her pay, and committed dakaitis on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title Debi Chaudhrani would emply that she was a Zamindar - probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture."[২৭]

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিক লিখেছেন– " মজনুনের একজন সহযোগী অঞ্চলে জলপথে ডাকাতি করিতেন। ১৭৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই সাতখানা বড় নৌকা ধরা পড়ে। তাঁহার সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোকও ডাকাতি করিতেন। তিনি নৌকাতেই বাস করিতেন এবং একদল বেতনভোগী বরকন্দাজ পোষণ করিতেন। সরকারী নথিতে এই দুইজনেরই উল্লেখ আছে।

মজনুন বা ভবানী পাঠক কেহই বাঙ্গালী ছিলেন না। মজনুন শাহ আলোয়ার রাজ্যের লোক, ভবানী পাঠক আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের অনুচরগণও

বাঙ্গালী ছিল না। কিন্তু সে যুগে যে বাঙ্গালী জমিদারেরাও ডাকাতের সর্দার ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন।"

* * * * * * * *

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের কাল্পনিক জীবনী ভিত্তি করিয়া উপন্যাস না লিখিলে আজ বাংলাদেশে কেহই তাহাদের নাম জানিত কিনা সন্দেহ।"[২৮]

'আনন্দমঠ': উপন্যাস ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গ (বীরভূম নয়) এবং ঘটনা কালের বিস্তার আনুমানিক ১৭৬৯ থেকে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস ইজারাদার দেবী সিংহ, ভূম্যধিকারী ও ডাকাতদের অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গ এবং ঘটনাকালের বিস্তার ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৬ সনের মধ্যে।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের সময়কালে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " .... বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই — হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী-সিংহের ইজারা।"[২৯]

দেবী চৌধুরাণীর শ্বশুর হরবল্লভের প্রসঙ্গে আমরা দেবী সিংহের কিছু কথা বঙ্কিমের কাছে শুনেছি — " দেশের দুর্দশার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুটিয়া লইল। সেবার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া

নওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেস্টিংস সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ ; বেচা-কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশহাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকী খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। .... এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না — শেষে হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন কে-আইন।" ৩০

বাংলাদেশে রাজকর এবং রাজকর আদায় বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন — " মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথমে আকবরী জমা ছাড়াইয়া উঠেন, অনিবর্দী তাহার উপর রাজকর কয়েক লাখ বাড়াইয়া দেন, এবং সর্বশেষে হতভাগ্য মীর কাসিম ইংরেজদের শোষণের ফলে মোট খাজনার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশী করিয়া তোলেন। কিন্তু নবাবের শাসনশক্তি যেই পলাশী ও উদুয়ানালার যুদ্ধের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, অথচ যখন ইংরেজেরা বণিকত্ব ত্যাগ করিয়া দেশশাসনের দায়িত্ব লইতে ইতস্তত: করিতে ছিলেন, কোন রকমে খাজনার টাকা আদায় হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, ঠিক সেই সময়, সর্ব প্রথমে সীমান্ত জেলাগুলিতে শান্তি চলিয়া গেল, অরাজকতা তন্দ্রা হইতে জাগিল, প্রজা দরিদ্র হইতে লাগিল, খাজনা কোথা হইতে আসিবে ? মীর কাসিমের বর্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল।" ৩১

ইজারাদার দেবী সিংহ অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার ও প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। ফলে " সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছাড়া রংপুরেও একটি ছোটখাট বিদ্রোহ হয়। রাজা দেবী সিংহ দিনাজপুর ও রংপুর জিলার ইজারাদার ছিলেন এবং বর্ধিত হারে জমিদারগণের নিকট হইতে জোর জুলুম করিয়া বহু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিতেন। ফলে এই সমুদয় জমিদারেরাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়া অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিত। ১৭৮২ সনে ইদ্রাকপুরের জমিদার এবং দিনাজপুরের রায়ৎগণ গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অভিযোগ করে। মালদহ হইতে চার্লস গ্র্যান্ট (Charles Grant)

রংপুরের কলেক্টরকে এই বীভৎস অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি : 'দরজা খুলিয়া দেওয়ায় পাঁচ ছয়টি শীর্ণকায় কঙ্কালের আকৃতি মানুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের দুই পা বান্ধা, হাটিবার শক্তি নাই, মনে হইল কথা বলিতেও পারে না। ইহাদের অধিকাংশই আট দশ দিন এইভাবে আটক ছিল এবং ইহার মধ্যে মাত্র দুই তিন বার দেবী সিংহের একটি চাকর দয়া করিয়া কিছু খাদ্য দিয়াছে। প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের প্রহার করা হইত, এবং পৃষ্ঠে তাহার দাগ পরিষ্কার দেখা যায়।'

বিদ্রোহীগণের আর্জিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য অতিরিক্ত করের ভারে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ঘরদুয়ার এমন কি সন্তান পর্যন্ত বেচিয়াছে, কিন্তু তবু আমলাদের দাবি মিটাইতে না পারায় এইরূপ কারাবন্ধ হইয়া অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে।

এইরূপ অত্যাচারের ফলে নানা স্থানের রায়ৎগণ সমবেত হইয়া দুর্লভ নারায়ণের পুত্র দুর্জয় নারায়ণকে নবাব ঘোষণা করিল এবং ডাকালিগঞ্জের কয়েদখানার ফটক খুলিয়া কয়েদিগণকে মুক্ত করিল। ক্রমে আরও অনেক রায়ৎ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সকলে মিলিয়া প্রতীকারের জন্য ডিমলার গোমস্তার নিকট গেল। গোমস্তার বরকন্দাজদের গুলিতে কয়েকজন রায়ৎ মরিল, কিন্তু লড়াই আরম্ভ হইল এবং গোমস্তা ধৃত ও নিহত হইল।

ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। দিনাজপুরে রায়ৎগণ আমলাদিগকে মারিয়া কাছারী লুট করিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইল এবং দলে দলে নানা পরগণার রায়ৎগণ তাহাদের দলে যোগ দিল। তখন সৈন্য পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। এই বিদ্রোহ দমনের পর যে সরকারী তদন্ত কমিশন বসান হয় তাহাতে দরিদ্র প্রজাদের উপর কি ভাবে উৎপীড়ন করিয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়াও অনেক টাকা আদায় করা হইত এবং তাহার ফলে প্রজাদের চরম দুর্দশার কাহিনী পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দেবী সিংহ হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি এতদূর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ৩২

দেবী সিংহের এই অত্যাচার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিস্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বার্ক্‌ সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোৎকীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত-কাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল — আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল।" ৩৩

ইতিহাস পাঠে আমরা জেনেছি যে, অতিরিক্ত অর্থের লোভে দেবীসিংহ জমিদারদের উপর এবং জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। এর ফলে মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে যে অরাজকতা এবং অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানীপাঠক, প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণীর কাছে 'ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে' ডুম্যধি-কারীদের সেই 'দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করেছেন — " কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুরিয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায় কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাড়িতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে, যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব সমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়।" ৩৪

আমরা 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনীকালে দেশের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম। আমরা জানলাম ইজারাদার দেবী সিংহ, অপরাপর জমিদারগণ এবং ডাকাতদের অত্যাচারের কথা। দেশে চোর-ডাকাত সৃষ্টির প্রধান কারণ দেবী সিংহ ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার

শাসন করে ? গুডল্যাড্ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।" [৩৫] আচার্য যদুনাথ সরকার দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীকাল এবং সে সময়ের দেশের অবস্থা চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন — " .... যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ 'দেবী চৌধুরাণী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙ্গালীরাও ডাকাতি করিত। .... আর, হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এদেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশোনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে তিনি পঠিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই — এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল ; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।" [৩৬]

দেবী চৌধুরাণী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সূত্র ভিন্ন কিংবদন্তী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেছেন। প্রফুল্লর প্রভূত ধন প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি আমাদের একটি কিংবদন্তীমূলক কাহিনী বলেছেন। গৌড়ের মুসলমান নবাব কর্তৃক উত্তরবঙ্গের হিন্দু রাজা নীলাম্বরের রাজ্য আক্রমন এবং নীলাম্বরের পরাজয় ও বন্দির ইতিহাসের কথা। দেবী চৌধুরাণী ভিন্ন 'বিবিধ প্রবন্ধ'এর 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' নামক প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। কিন্তু " যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল।" [৩৭] কৃষ্ণগোবিন্দের মাধ্যমে এই ধন প্রফুল্লের হস্তগত হল;— এটি কিংবদন্তী কথা। এখানে ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তীকে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে একসূত্রে গেঁথে তুলেছেন।

দেবী চৌধুরাণী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন — " আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি — কথায় কথায়

ডাকাইতের কথা বলিতেছি — ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল - কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।" [৩৮] এ থেকে অনুমান হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল দেখে থাকবেন। যার ভিত্তিতে তিনি একথা বলেছেন এবং জঙ্গলের বর্ণনা করেছেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, " ফলতঃ ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করিবার পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং 'দেবী'ও অদৃশ্য হন।" [৩৯]ইংরেজদের হাতে দেবী ধরা পড়েছিলেন বা সংঘর্ষে দেবীর মৃত্যু হয়েছিল এমন কোন বিবরণ আমরা পাই না। উপন্যাসের শেষেও আমরা দেখি যে দেবীরাণী তাঁর দল ভেঙে দিয়েছেন এবং সাগরকে বলেছেন — " .... দেবী মরিয়া গিয়াছে। .... প্রফুল্লও মরিয়াছে। .... আমি নূতন বৌ।" [৩৯ক] সুতরাং দেবীর পরিণামে ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু ভবানী পাঠক প্রায়শ্চিত্তের জন্য ইংরেজের হাতে ধরা দিয়ে দোষ স্বীকার করলেন এবং তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল — বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিবরণ ইতিহাস সম্মত নয়। কারণ ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে ভবানী পাঠকের দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তত্ত্বটি অনৈতিহাসিক বলে বর্জন করতে হয়। কারণ, ভবানী পাঠক ডাকাত ছিলেন এবং তিনি এ জাতীয় তত্ত্বের ধার ধারতেন না।

দেবী চৌধুরাণী ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না।এই উপন্যাসে তিনি ব্যষ্টির আধারে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই কারণে তিনি দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চাননি। তবু এর ঐতিহাসিক অংশের সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না।

সীতারাম

সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১২৯১) থেকেই 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'হিন্দুধর্ম' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে বাঙালীর বীরত্ব এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। আর বাঙালীর বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা মাথায় রেখেই 'সীতারাম' উপন্যাস রচিত।

সীতারাম উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সীতরাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছু রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করুন।" [80] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে ইতিহাসের দিকটিকে অস্বীকার করেছেন।

পক্ষান্তরে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন — "বাঙ্গালীর বল এবং সুসংস্কৃত হিন্দু-ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামের' সূচনা। পরিষৎ - সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় বলেন, 'গ্রন্থশেষে (পরিষৎ - সংস্করণের 'সীতারাম') 'পাঠভেদ' অংশে কয়েকটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদের সহিত "প্রচারে' প্রকাশিত উক্ত অংশ মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে দিয়া 'হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনে'র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন'। কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বপ্ন তাঙ্গিয়া চুরিয়া 'সীতারাম'কে এই শোচনীয় ও ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতেই পরিণত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে হইলে এরূপ না করিয়া হয়ত উপায়ও ছিল না।" [৪১] বাগল মহাশয়ের মতে ইতিহাসের দিকটিকে স্বীকার করতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ' স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পের অনুরোধে সত্যকে বিকৃত করেন নি।

আচার্য যদুনাথ সরকারও বলেছেন — " .... বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গালার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য ; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচন্ড অপলাপ করেন নাই ; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথাও তাহা হয় নাই। এর উপর সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ বিগ্রহ - প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।" [৪২] অর্থাৎ ঐতিহাসিক 'সীতারাম' উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্যতাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার আমাদের আরও জানিয়েছেন যে, — " বঙ্কিমের 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার ঐতিহাসিক সত্যাসত্যতা লইয়া অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে।" [৪৩] অর্থাৎ সীতারামের ঐতিহাসিকতা বিচারের চাবিকাঠি আমরা পাচ্ছি।

ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার রাজা সীতারাম রায়ের ইতিহাস এই ভাবে বিবৃত করেছেন — " সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল সুবাদারের আনুগত্য স্বীকার করিত। কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো-ভূঁইদের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের অধীনে একজন সামান্য রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার সরবাদারের নিকট হইতে নলদি (বর্তমান নড়াইল) পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার পান। কথা ছিল যে, তিনি নিয়মিত ভাবে সুবাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্যুর দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সততা ও দক্ষতার ফলে বাংলার সুবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার তাহার হাতে দেন। এই ভাবে সীতারাম একদল সৈন্য

সংগ্রহ করেন। তিনি সুবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ করেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকৃষ্ট হইয়া বহু বাঙালী সৈন্য তাঁহার সহিত যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দশ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী গ্রামে এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন মুসলমান ফকিরের অনুরোধে তিনি নূতন রাজধানীর নাম রাখেন মহম্মদ-পুর। এবং অনেক মন্দির, সুরম্য হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং বৃহৎ বৃহৎ দীঘি কাটাইয়া ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে সুবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯–১৬৯৭ খ্রিঃ) দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে সুবাদার আজিমুস্সানের সহিত মুর্শিদকুলী খানের কলহের সুযোগ লইয়া তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার মুর্শিদকুলী খান সীতারামের শক্তি ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ভূষণার ফৌজদারকে একদল সৈন্যসহ পাঠাইলেন। পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সেনাদলও সুবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দুরাজ্যের পতন হইল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন।" [৪৪]

আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারামের যে ইতিহাস জানিয়েছেন তা' নিম্নরূপ –

"Sitaram Ray of Bhushna, an Uttar Rarhi Kayatha, and the son of the Hindu Collector under the Muslim Foujdar of Bhushna (16 miles east of Magura in the Khulna district) took a lease of the Naldi Pargana (Modern Narail) from the Bengal Subadar, promising to pay the revenue regularly and to suppress the rebel Afgan and bandit gangs of that tract (c.1688) .... He is even said to have secured an imperial forman and title of Raja

by paying tribute to the Emperor of Delhi. To keep up this new dignity he founded as new capital at the Village of Bagjani (10 miles from Bhushna) and named it Muhammadpur (in honour of Muslim saint) .... In pride of power, he humbled and robbed the smaller Zamindar of the country round and stopped sending any revenue to the Subadar ....

At last in 1713 when he killed Sayyid Abu Turb, the Foujdar of Hugli, Murshid Quli could no longer overlook his audacity. A strong force was detached under Murshid Quli's relative Baks Ali Khan (newly appointed Foujdar of Bhushna); and with the help of all the neighbouring Zamindars levis, Sitaram was overwhelmed and captured with his family, and his capital was sacked (February - March 1714). Thus fell the last Hindu Kingdom in Bengal." [৪৫]

বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী সূচনা করেছেন প্রায় একশ' আশী বছর আগে পূর্ববঙ্গের ভূষণা নগরীতে। আমরা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'প্রায়' শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। কারণ, 'সীতারাম' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯১ সনের শ্রাবণ মাসে, 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। সে সময় থেকে একশ' আশী বছর পিছনে হিসাব করলে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ পাচ্ছি। কিন্তু 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা ১৭০৪খ্রিস্টাব্দের আগে। যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন — " ১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক রাজসুখ ভোগ করিলেন।" [৪৬] গঙ্গারামের সঙ্গে ফকিরের বিবাদ ইত্যাদি ঘটনার পরেই সীতারাম রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। সুতরাং সীতারাম উপন্যাসের কাহিনী সূচনা ১৬৯৯খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে হওয়াই সম্ভব। এই কারণে 'প্রায়' শব্দের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে থেকে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

উপন্যাসের সূচনাতে গঙ্গারামের সঙ্গে ফকিরের বিবাদকে কেন্দ্র করে, গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুমের ঘটনাটি, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নয়। সে যুগের বাংলাদেশে এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — "বাঙ্গালাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, অহা সলিমুল্লা ও গুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন;: একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজান পড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েকখানা ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন।" [৪৭]

সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ মধুমতী নদীর তীরে শ্যামনগর নামে একটি জোতের বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। উপন্যাসে আমরা দেখছি যে, গঙ্গারামকে উদ্ধার করার পর সীতারাম তাকে শ্যামপুরে যাবার কথা বলেছেন। পরে সীতারামও সেখানে এসে উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন সম্পর্কে লিখেছেন — "মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। .... যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক, যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্রগ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্মাণে মনোযোগ দিলেন। .... তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজকর্ম সকল নির্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। .... কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; ....। .... এই সময়ে চাঁদশাহ নামে একজন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার পরামর্শমতে, নব সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন 'মহম্মদপুর'।" [৪৮]

মধুমতী নদীর তীরে সীতারামের সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী নির্মাণ এবং তার 'মহম্মদপুর' নামকরণ ইতিহাস সম্মত। সতীশচন্দ্র মিত্র সীতারামের রাজধানীর স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করে বলেছেন — "মহম্মদপুরের অবস্থান,অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চস্থল। তৃষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দিক হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখার দ্বারা দক্ষিণ দিক্ দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। অপর দুই দিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।" [৪৯] A Report of the District of Jessore গ্রন্থে J. Westland সীতারামের রাজধানীর যে বিবরণ দিয়েছেন,বিজিত কুমার দত্ত তার সার-সংকলন করে লিখেছেন — "সীতারামের দুর্গ ছিল চতুষ্কোণ। রামসাগর, সুখসাগর নামে দুটি দীঘি তিনি খনন করেন। রাজার কাচারী, দোলমন্দির, কোষাগার, সিংহ-দরজা, শিবমন্দির, তোষাখানা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কৃষ্ণমন্দির ইত্যাদি সীতারামের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রথযাত্রা এবং নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনায় বুঝতে পারি লোকে তখন মোটামুটি সীতারামের রাজত্বে ভালোই ছিল।" [৫০]

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিনজন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারু-রূপে নির্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃন্ময় এবং ক্ষিপ্রতায় গঙ্গারাম।" [৫১] গঙ্গা-রামের কোন ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু চন্দ্রচূড় ও মৃন্ময়ের কিছু

ঐতিহাসিক পরিচয় আছে। যদুনাথ সরকার লিখেছেন — "বিশাল নলদী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার দুইজন বড় বন্ধু জুটিল ; একজন রঘুরাম (পক্ষান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতি এই ডাকনামে খ্যাত সেনাপতি হইলেন। অপরজন মুনিরাম রায়, বর্গজ কায়স্থ, উকীল (মন্ত্রনাদাতা অর্থাৎ ফরেন সেক্রেটারী) হইলেন। তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড় হইবেন।" [৫২] যদুনাথ কথিত মেনাহাতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপনয়সে মৃন্ময়। যদুনাথ গাঙ্গুলী বা চন্দ্রচূড় এবং মেনাহাতি বা মৃন্ময় সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত বিবরণ সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সীতারাম উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদকুলী খাঁ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — "আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুরশিদ্ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল — বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না।" [৫৩] এই সঙ্গে তারকাচিহ্নিত করে মুরশিদ্ কুলি খাঁ সম্পর্কে তিনি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন — "ইংরেজ ইতিহাস বেত্তাগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌল্লা ঘৃণিত এবং মুরশিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।" [৫৩ক]

মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিষ্ঠিত নবাবী আসল ও শাসনের প্রধান পরিবর্তন হিন্দু জমিদার-দেরউৎপত্তি । ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "যে সকল জমিদার নিয়মিত রাজস্ব দিতেন মুর্শিদকুলী খান তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবি করিতেন না। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খাদ্য বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। ঐ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া

তাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুণ্ঠ। অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আমিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্ত্রীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এইসব আমিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায় করিতেন।" ৫৪

মুর্শিদ কুলি খাঁ যে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করতেন তা' ঐতিহাসিক সত্য। সেই সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত রাজস্বের আশায় দেশের মানুষকে নানা ভাবে শোষণও করতেন। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার, চন্দন নগরের ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের প্যারিস নগরীতে কর্তাদের পাঠান রিপোর্টের (Kaeppelin, La Compagie Indes Orientales et. F. Martin) অংশ বিশেষ অনুবাদ করে আমাদের জানিয়েছেন— " বাদশাহ কর্তৃক অসামান্য ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদ কুলি খাঁ) নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না। .... সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাকা অধিক হইতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।" ৫৫

তবে এটাই মুর্শিদকুলি খাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর চরিত্র অনেকটা আলো-আঁধারের মতো দোষ ও গুণের সমন্বয়ে গঠিত। মুর্শিদকুলি খাঁ অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। স্টুয়ার্ট মুর্শিদকুলি খাঁর প্রশংসা করতেগিয়ে গ্লাডউইনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন —

"Excepting Shaisteh Khan there has not appeared in Bengal, nor indeed in any part of Hindoostan, an Ameer who can be compared with Moorshed Cooly, for zeal in propagation of faith for wisdom, in the establishment of laws and regulations; for munificence and liberality, ... for rigid and impartial justice, ... in short whose whole administration so much tender to the benefit of mankind and the glory of the creator." ৫৬

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "মুর্শিদকুলী খান গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন। জগৎশেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরাও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।" [৫৭] মুর্শিদ কুলি খাঁ অত্যন্ত প্রবল হিন্দুদ্রোহী হলে এটা সম্ভব হত না। তাই বোধ হয় তাঁকে 'মহাপাপিষ্ট' 'মনুষ্যাধম' বলা ঠিক নয়।

সীতারাম উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িল। সে সকল ঐতিহাসিক সত্য।" [৫৮] সীতারামের ভূষণা অধিকার ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মৃন্ময়ের হাতে তোরাব্ খাঁর মৃত্যু ঐতিহাসিক সত্য নয়। তোরাব্ খাঁর মৃত্যু হয়েছিল সীতারামের হাতে। 'রিয়াজ-উস-সালতিন'-এর বিবরণ অনুসারে সীতারামকে ধরবার জন্য তোরাব্ খাঁ তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ পীর খানকে দুশো সৈন্য আনতে বললে

".... On being apprised of this Sitaram concentrating his forces lay in ambush to attack aforesaid general (Pir Khan). One day Mir Abu Turab with a number of friends went out for hunting, and in that heat of the chase alighted on Sitaram's frontires Pir Khan was not in Abu Turab's Company. The Zaminder (Sitaram) on hearing of this fancing Mir Abu Turab to be Pir Khan suddenly issued out from the forest with his forces and attacked Mir Abu Turab from the rear. Although the later with a loud voice announced his name, sitaram not hearing it inflicted wounds on Abu Turab with bamboo-clubs, and felled him from his horse." [৫৯]

স্টুয়ার্ট বলেছেন যে সীতারাম তোরাব্ খাঁকে চিনতে না পেরে হত্যা করেন এবং "When Sitaram found that it was the Foujdar he had slain, he much regretted the circumstances,..."[৬০] এই প্রসঙ্গে মৃন্ময়ের মৃত্যু প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমনে আসিতেছে ....। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহন করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পালাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।"[৬১] কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন যে, মৃন্ময় বা মেনাহাতি স্নানের সময় অতর্কিত আক্রমনে নিহত হন।[৬২]

মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজার মতো রাজত্ব শুরু করলেও সীতারাম রাজা নাম ধারণ করেন নি। "কেননা দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন।"[৬৩] পরবর্তীকালে সীতারাম দিল্লী গিয়েছেন এবং বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি ও ফর্মান পেয়েছেন। তবে যদুনাথ সরকার বলেন — "সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফর্মান আনিয়া মহাগৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।"[৬৪] খুব সম্ভব রাজা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে যেভাবে ফর্মান পান, বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রভাবে সীতারামকে দিল্লী প্রেরণ করেছেন।

রাজা হবার পর ১৭১৩খ্রিস্টাব্দে সীতারাম রায় ভূষণার ফৌজদার আব্দু তোরাবকে হত্যা করে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামকে দমন করার জন্য নতুন ফৌজদার ও তাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য জমিদারদের সেনারা যুক্ত হয়। যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর সীতারামের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত

লৌহপিন্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পালাইতে লাগিল। সূচী ব্যূহের পথ সাফ। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুটিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।" ৬৫

কিন্তু ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে, সীতারাম যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী হন এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " মুর্শিদাবাদে সীতারামের নৃশংস প্রাণদন্ডের বিবরণ সলিমুল্লার তারিখ–ই–বাংগালাতে এবং পরে স্টুয়ার্টের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খন্ড,)৫৮৯–৬০০ পৃ:)।" ৬৬

সীতারামের প্রাণদন্ড সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা ছিল না ; কিন্তু তবু যে তিনি সীতারামকে 'বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ' করিয়াছেন, তার প্রধান কারণ বোধ হয় বাংলাদেশের শেষ হিন্দু রাজার প্রতি দুর্বলতা। তবে বিষয়টি যে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন,ছিলেন। সে কারণে উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশে বঙ্কিমচন্দ্র রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কথোপকথনে বিষয়টি আমাদের সামনে এনেছেন —

" রাম । রাজা–রাণীর কি হলো, কিছু ঠিক খবর রাখ ?

শ্যাম । শোনা যাচ্ছে, তাঁদের না কি বেঁধে মুরশিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম । আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুনতে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছে। তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।" ৬৭

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে সীতারামের বিষপানে মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন Westland. [৬৮]

সীতারামের রূপতৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা থেকে ভোগস্পৃহা, ভোগস্পৃহা পূরণের জন্য রাজ্যের কুলবধূ ও কুলকন্যাদের অপহরণ করে বলপূর্বক উপভোগ কারণে ধর্মচ্যুতি এবং রাজকার্য পালনে অবহেলাই সীতারামের পতনের কারণরূপে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন — " রমণীবর্গের সংশ্রবই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের পতনের অন্য কারণ ছিল। তাঁহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, ... ইহা ভিন্ন তাঁহার উপপত্নী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের দিকে যে তাঁহার লালসা ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বা রাজবলের অপব্যয়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বন্দী পরিবারের মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। সুতরাং, পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লান্ত বীর শত যুবতীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদের দিনক্ষয় বা দেহক্ষয় করিতেন, এমন 'রচা' গল্প আমি বিশ্বাস করি না।"[৬৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম – এই তিনটি উপন্যাসেই অত্যাচারের পটভূমিকায় নবীন শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আনন্দমঠে, মহাপুরুষের মতে, সন্তান – বিদ্রোহের কারণ, ইংরেজকে রাজ্য-শাসন গ্রহণে বাধ্য করা। দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতি প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম-সাধনা। কিন্তু সীতারামের সংগ্রামের উদ্দেশ্য 'হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠা'। মুসলমানের অত্যাচারের পট-ভূমিতে " হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?" [৭০] শ্রী-র এই উক্তিই সীতারামের অন্তরে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে তাঁকে বিদ্রোহী এবং হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু ছিল ; সীতারামের উক্তি – " তুমি শ্রী। এত সুন্দরী !"[৭১] অর্থাৎ রূপ-তৃষ্ণার প্রাবল্য। সীতারাম আপন বল, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা গুণে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও আত্মসংযমের অভাবে তার পতন হল। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামে ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করেন নি আবার উপন্যাসের সত্যকেও রক্ষা করেছেন। তিনি ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে অসাধারণ সৃষ্টি-চাতুর্য গুণে অনুশীলন তত্ত্বকে যুক্ত করে সীতারামের মহান ট্র্যাজেডি অংকন করেছেন।

॥ সূত্র - নির্দেশ ॥

১। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, 'দুর্গেশনন্দিনী', ১৩৫৮, পৃঃ ৫।

২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, 'আনন্দমঠ' ১৩৬৪, পৃঃ ৭।

৩। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৭–৮।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৬৪।

৫। W.W.Hunter — The Annals of Rural Bengal, Vol. I, 1872, p.20-21.

৬। W.W.Hunter — Ibid, p.26-27.

৭। উদ্ধৃতি, — Hunter's The Annals of Rural Bengal, Vol.I, Appendix-B,1872, p.399.

৮। W.W.Hunter — Ibid, p.23.

৯। V.A. Smith — Oxford History of India,1958, p.508.

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭১।

১১। যোগেশচন্দ্র বাগল — উপন্যাস প্রসঙ্গ, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪২।

১২। W.W.Hunter — The Annals of Rural Bengal, Vol.I, 1872, p.70-72.

১৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১—২২।

১৪। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, আনন্দমঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ১০।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭৫।

১৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৮।

১৭। J.M. Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal, 1930, p.12.

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৯৩।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭২৮।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খন্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৩২।

২১। J.M.Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal , 1930, p.58.

২২। যদুনাথ সরকার — 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', আনন্দমঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ১২–১৩।

২৩। উদ্ধৃতি J.M.Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal, 1930, p.58.

২৪। Humayun Kabir — The Bengal Novel, 1968, p.14.

২৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৩৫।

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপণ, দেবী চৌধুরাণী ; উদ্ধৃতি - যোগেশচন্দ্র বাগল, উপন্যাস প্রসঙ্গ, দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৪।

২৭। W.W.Hunter — A Statistical Account of Bengal, Vol.II, 1875, p.158-59.

২৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১–২২।

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫০।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৬৯।

৩১। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৭।

৩২। রমেশচন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২৪–২৫।

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫০।

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃঃ ৭৬৭।

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), পৃঃ ৭৫১।

৩৬। যদুনাথ সরকার – 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫।

৩৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫৪।

৩৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃঃ ৭৮৬।

৩৯। যদুনাথ সরকার – 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫।

৩৯ক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী–চৌধুরাণী, তৃতীয় খন্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী, (১মখন্ড) ১৩৯২, পৃঃ ৮১৮।

৪০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপন, সীতারাম ; উদ্ধৃতি — যোগেশ চন্দ্র বাগল, উপন্যাস প্রসঙ্গ, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৭।

৪১। যোগেশ চন্দ্র বাগল — উপন্যাস প্রসঙ্গ, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৬।

৪২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৫।

৪৩। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৫।

৪৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১০–১১।

৪৫। Jadu Nath Sarkar — History of Bengal, Vol.II, 1948, p.416.

৪৬। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১১।

৪৭। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১৩।

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৪–৩৫।

৪৯। সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোহর - খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৯৬৫, পৃঃ ৫৫০।

৫০। বিজিত কুমার দত্ত — বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ১২৬।

৫১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৫।

৫২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৭।

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৪৫।

৫৩(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪৫ (টীকা)।

৫৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১১–১২।

৫৫। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১১।

৫৬। উদ্ধৃত Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p. 460.

৫৭। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১২–১৩।

৫৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৬৬।

৫৯। Ghulam Husain Salim — Riyazu-S-Salatin, Trn. & Ed. by Abdus Salam, 1904, p.266.

৬০। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.433.

৬১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৯৮।

৬২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৮।

৬৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৫।

৬৪। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৭।

৬৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৯০৪।

৬৬। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৯।

৬৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, পরিশিষ্ট, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৯০৫—৬।

৬৮। J.Westland -- A Report of the District of Jessore, 1874, p. 27-28.

৬৯। সতীশচন্দ্র মিত্র – যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৯৬৫, পৃঃ ৫৮৩-৮৪।

৭০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – সীতারাম, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮২৪।

৭১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৩।

রমেশচন্দ্র মজুমদার – বাংলা দেশের ইতিহাস (২য় খন্ড)
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৩৮৫।

রমেশচন্দ্র মজুমদার – বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড)
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৯৮১।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড)
নবভারত,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খন্ড)
নবভারত,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় – প্রথম শিক্ষা - বাঙ্গালার ইতিহাস
দি সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটোরি
কলিকাতা, ১৮৮৬।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিম জীবনী,
(অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত)
পুস্তক বিপণি,
কলিকাতা, ১৩৯৫।

সতীশচন্দ্র মিত্র – যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড)
প্রকাশক - শিবশঙ্কর মিত্র,
পরিবেশক - দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৯৬৫।

সত্যনারায়ণ দাশ – বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা,
জিজ্ঞাসা,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

সুকুমার সেন — ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস
গ্রন্থ প্রকাশ,
কলিকাতা, ১৩৭৩।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — বঙ্কিমচন্দ্র,
এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ,
কলিকাতা, ১৯৭২।

সোমেন্দ্র নাথ বসু (সম্পাঃ) — কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র,
বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা, ১৯৬৪।

॥ খ ॥

A.A.Macdonel — A History of Sanskrit Literature,
Motilal Banarasidass,
Delhi, 1971.

Abul Fazal — Akbarnama, Vol. III,
Trn. by A.Baveridge,
The Royal Asiatic Society of Bengal,
Calcutta, 1939.

A.C.Gupta (ed.) — Studies in the Bengal Renaissance,
The National Council of Education,
Bengal, Calcutta (Jadavpur), 1958.

Beni Prasad — History of Jahanagir,
The Indian Press (Publication) Pvt.Ltd.
Allahabad, 1962.

Bankim Chandra Chatterjee — Bankim Rachanavali, Vol.III,
Sahitya Samsad,
Calcutta, 1969.

C.M.Philips (ed.) — Historians of India, Pakistan and Ceylon,
Oxford University Press,
London, 1967.

Charles Stewart — History of Bengal,
Bangabasi,
Calcutta, 1904.

Ghulam Husain Salim — Riyazu-S-Salatin,
Trn. by Maulavi Abdus Salam
The Asiatic Society,
Calcutta, 1904.

H.Blochmann — Contribution to the Geography and History of Bengal (Muhammadan period)
The Asiatic Society,
Calcutta, 1968.

Humayan Kabir — The Bengali Novels,
Firma K.L.Mukhopadhyay,
Calcutta, 1968.

Jadu Nath Sarkar — History of Bengal, Vol.II,
University of Dacca,
Dacca, 1948.

John Clark Marshman — History of Bengal,
Serampore Press,
Serampore, 1871.

Kalhana — Rajtarangini,
Trn. & Ed. by Vishva Bandhu,
Vishvesh Varanandan Vedic
Research Institute,
Hoshiarpur, 1963.

Kautilya — Arthashastra,
Trn. & Ed. by Raghu Nath Singh
Krishnadas Academy,
Varanasi, 1983.

L.S.S.O.Malley — Bengal District Gazetters; Hooghly
Govt. of Bengal,
Calcutta, 1912.

Minhaj-I-Siraj — Tabakat-I-Nasiri,
Trn. by H.G.Raverty,
Oriental Books Reprint Corporation,
Delhi, 1970.

N.K.Sinha — The History of Bengal; 1757-1905
University of Calcutta,
Calcutta, 1967.